গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ৭ সংখ্যা | ১৩ - ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

মহান মাও সে তুঙ স্মরণে

৯ সেপ্টেম্বর মাও সে তুং স্মরণদিবসে দলের শিবপুর সেন্টারে সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। কেন্দ্রীয় দফতরেও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়

সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত হতাশাজনক

আর জি কর মামলায় সুপ্রিম কোর্টে দ্বিতীয় দিনের শুনানি সম্পর্কে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৯ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন অত্যন্ত ন্যায়সংগত একটি আন্দোলন যা শুধু এ দেশ নয়, বিদেশেরও বড় অংশের মানুষের সমর্থন লাভ করেছে। সুপ্রিম কোর্টের আজকের সিদ্ধান্ত হতাশাজনক। বিলম্বিত হচ্ছে বহু প্রত্যাশিত বিচার। ভবিষ্যতই বলবে ন্যায়বিচার মিলবে কি না। ন্যায়বিচার পেতে হলে নানা উপায়ে আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধিই একমাত্র রাস্তা।

দোষীদের আড়াল করে মৃত্যুদণ্ড চাওয়া প্রতারণা ছাড়া আর কী

অপরাজিতা আইন

আর জি করের চিকিৎসক-ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দোষীদের আড়াল করার অভিযোগে রাজ্য জুড়ে মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। ঠিক সেই সময়েই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ধর্ষণের ঘটনায় দোষীর শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ড চেয়ে তড়িঘড়ি নতুন আইন 'অপরাজিতা মহিলা ও শিশু (পশ্চিমবঙ্গ ফৌজদারি আইন সংশোধন) বিল ২০২৪' আনার ঘটনাকে মানুষ প্রহসন ছাড়া আর কিছুই মনে করছে না। বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশন ডেকে নতুন বিল এনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ধর্ষণের ঘটনায় মৃত্যুতে কিংবা নির্যাতিতা জীবন্মৃত হয়ে গেলে একমাত্র শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ড নিয়ে এসেছেন। অন্যান্য ক্ষেত্রেও শাস্তির কঠোরতা বাড়িয়েছেন।

আর জি করের ঘটনায় দোষীদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে যখন গোটা সমাজ উত্তাল হয়ে উঠেছে, মানুষ যখন এই ঘটনা আড়াল করার দায়ে পুলিশ ও রাজ্য সরকারকেই দায়ী করছে, এমন এক সময়েই রাজ্য সরকার এই আইন নিয়ে এল। স্বাভাবিক ভাবেই জনমনে এ প্রশ্ন প্রকট হয়ে উঠছে যে, সরকারের এমন একটি বিল আনার উদ্দেশ্য কী? এই বিলের কি সত্যিই কোনও প্রয়োজন ছিল? যে আইন ইতিমধ্যেই রয়েছে তাতেই কি দোষীকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া যায় না?

বাস্তবে গোটা সমাজ জুড়ে বিক্ষোভ ফুঁসে ওঠার পরই মুখ্যমন্ত্রী দোষী বলে গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিকে ফাঁসি দেওয়ার কথা বলেছিলেন। সেই ফাঁসি নিশ্চিত করতেই কি এই কঠোর সাজার বিল নিয়ে এলেন তিনি? প্রশ্ন উঠেছে, সরকারের আনা এই বিলের কঠোরতা অপরাধী না অপরাধ কার বিরুদ্ধে? অপরাধীই কি এই বিলের লক্ষ্য? যদি তাই হয় তবে তো তিনিও জানেন, আর জি করের ঘটনা এই আইন

দুয়ের পাতায় দেখুন

জনতার আদালত

৯ সেপ্টেম্বর বিচারহীনতার একমাসে কলকাতার পাঁচটি জায়গায় বিশিষ্ট আইনজীবী, বিচারপতি ও চিকিৎসকদের পরিচালনায় জনতার আদালত বসে। বহু মানুষ বক্তব্য রাখেন। ছবি ঃ শ্যামবাজার

বিচারহীনতা অবসানের শপথে উজ্জ্বল 'অভয়ার রাত'

৮ সেপ্টেম্বর পেরিয়ে গেল সেই অভিশপ্ত রাতের একটি মাস। দিনটি চিহ্নিত হয়েছিল 'অভয়ার রাত' হিসাবে। সে দিন আবার পথে নামলেন হাজার হাজার মানুষ। ওই দিনই সারা বিশ্বে এক সাথে পালিত হল মানব বন্ধন। এই একটি মাসে এমন একটি দিনও ছিল না যেদিন প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে রাস্তায় নামেনি মানুষ। এমন একটি পাড়া মহল্লা পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যাবে না, যেখানকার মানুষ আন্দোলন থেকে দূরে থেকেছেন। ঘটনার তদন্তের ভার কলকাতা পুলিশের হাত থেকে হাইকোর্টের মাধ্যমে সিবিআই নিয়েছে। স্বতঃপ্রণোদিত মামলা শুরু করেছে সুপ্রিম কোর্ট। তার শুনানির দিনের আগেও অপার আগ্রহে বিনিদ্র রাত কাটিয়েছেন বহু মানুষই। ৯ সেপ্টেম্বরের শুনানিতে কার্যত কিছু না পেয়ে সে দিনই তাঁরা বহু জায়গায় ডাক দিয়েছিলেন 'জনতার আদালত' বসানোর। মুখে মুখে ফিরেছে কথা—'দিন দিন বিচারহীন, আর কত দিন, আর কত দিন!' হাজারে হাজারে মানুষ জোট বেঁধেছেন— বিচারের বাণীকে নীরবে নিভৃতে হারিয়ে যেতে আর দেব না আমরা— এই দৃঢ় পণ নিয়ে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে 'বিচার চাই' 'জাস্টিস ফর আর জি কর' স্লোগান তুলছেন যাঁরা, তাঁদের কেউ অধ্যাপক, চিকিৎসক, কেউ সাধারণ দোকান কর্মচারী। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমাজের সব স্তর থেকে বহু বেড়া ভেঙে তাঁরা এসেছেন। সকলে একে অপরকে চেনেন না। তবু অদ্ভুত এক বন্ধন তাঁরা অনুভব করছেন নিজেদের মধ্যে। আবার এর মধ্যেই কেউ রাজ্য, কেন্দ্র উভয় সরকার এবং বিচারবিভাগের ভূমিকা দেখে ভাবছেন— এত করছি, বিচার পাওয়া যাবে তো? আন্দোলন সফল হবে তো?

এই আন্দোলন চলতে চলতেই পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলায় ঘটে চলেছে ধর্ষণ, নারী নির্যাতনের নানা ঘটনা। কাটোয়ায়

পাঁচের পাতায় দেখুন

ন্যায়বিচার পেতে আন্দোলনই রাস্তা

আর জি কর আন্দোলনের প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রেস বিবৃতি প্রসঙ্গে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৯ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

সুপ্রিম কোর্টের বিচারহীনতায় হতাশার মাঝে আজ মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে জুনিয়র ডাক্তারদের কার্যত যে ভাবে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে এবং এই নৃশংস ঘটনায় মানুষের মন যখন বেদনাদীর্ণ তখন তাদের উৎসবে ফিরে আসার যে নিদান দেওয়া হয়েছে— আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি। শুধু তাই নয়, রাজ্য সরকারের আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টে রোগীর মৃত্যুর জন্য যে ভাবে বিচারপ্রার্থী জুনিয়র চিকিৎসকদের দায়ী করেছেন এবং প্রতিবাদের নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে যে বিবৃতি দিয়েছেন, তা একটি অসত্যভাষণ। সকলেই জানেন, ১৪ আগস্ট রাত থেকে 'জাস্টিস ফর আর জি কর' স্লোগান সহকারে লক্ষ লক্ষ মানুষ যে সক্রিয় প্রতিবাদ করেছেন— তাতে সামান্যতম বিশৃঙ্খলাও দেখা যায়নি। আমরা মনে করি, সর্বস্তরের মানুষের যে অভূতপূর্ব প্রতিবাদ এই নারকীয় ঘটনার বিচার চেয়ে রাস্তায় আছড়ে পড়ছে, সেই আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধির দ্বারাই বিচার পাওয়া সম্ভব হবে। সেই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানাচ্ছি।

প্রতারণা ছাড়া আর কী

একের পাতার পর

হওয়ার আগে ঘটেছে। অতএব তা এই আইনের আওতার বাইরে। দ্বিতীয়ত, এক জন অপরাধীর যত দিনে ফাঁসি হবে, তত দিনে আরও অনেকগুলি অপরাধের ঘটনা ঘটে যাবে। অথচ যে সামাজিক পরিবেশ প্রতি মুহূর্তে সমাজে এমন অসংখ্য অপরাধীর জন্ম দিয়ে চলেছে, সেই পরিবেশকে বদলানোর কোনও কথা সরকারের ভাবনাতেও নেই, আইনেও নেই। সরকারের রাজ্যপাট চালানোর গোটা প্রক্রিয়াতেই তা নেই। বরং তাঁদের শাসন-নীতিই অপরাধী তৈরি হওয়ার জমি ক্রমেই উর্বর করে চলেছে।

দোষীদের আড়াল করার সরকারি আয়োজন

দেখা যাক সত্যিই অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া এই আইনের লক্ষ্য কি না। প্রথম থেকেই আর জি করের ঘটনায় প্রকৃত অপরাধীকে আড়াল করার চেষ্টা প্রশাসনের সমস্ত স্তরে প্রকট। চিকিৎসকের মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা, এফআইআর করতে অযথা দেরি করা, পরে যাঁদের সাসপেন্ড করা হল, শুরুতেই তাঁদের এমনকি জিজ্ঞাসাবাদটুকুও না করা, পদত্যাগ করতে বাধ্য হওয়া অধ্যক্ষকে অতি দ্রুত আর একটি মেডিকেল কলেজে অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগপত্র দেওয়া, মৃতদেহ যেখানে পাওয়া যায় সেই সেমিনার রুম সংলগ্ন অংশ অতি দ্রুততায় ভেঙে ফেলা, বহিরাগত দুষ্কৃতীদের দ্বারা আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকদের মঞ্চ ও হাসপাতালে ভাঙচুর আটকাতে এবং তাদের পিছনে আসল মাথাগুলিকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হওয়ার মতো ঘটনাগুলির কোনওটিই সরকারের অপরাধীদের চিহ্নিত করে গ্রেফতারের সদিচ্ছার প্রমাণ নয়।

ইতিমধ্যে এই সরকারের শাসনে ঘটে যাওয়া পার্ক স্ট্রিট-কামদুনি-কাটোয়া-হাঁসখালির মতো ধর্ষণের ঘটনাগুলির কোনওটিতেই সরকারের এই আগ্রহ প্রকাশ পায়নি। বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী থেকে নানা মন্ত্রী নানা কথার ছলে ঘটনার গুরুত্ব লঘু করার চেষ্টা করেছেন। পার্ক স্ট্রিটে ধর্ষণের অভিযোগ উঠলে মুখ্যমন্ত্রী এক কথায় তাকে সাজানো ঘটনা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। পরে তদন্তে ধর্ষণের প্রমাণ মিললে তদন্তের দায়িত্বে থাকা পুলিশ অফিসারকে অন্যত্র বদলি করে দিয়েছেন। কামদুনির ঘটনায় প্রতিবাদকারীদের মাওবাদী বলে ধমক দিয়েছিলেন। ২০১২ সালে কাটোয়ায় ধর্ষণের অভিযোগ উঠলে, ঘটনাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছিলেন, মহিলার স্বামী বিরোধী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। হাঁসখালির ঘটনাতেও ধর্ষণকে লঘু করে দেখাতে তিনি বলেছিলেন, মেয়েটির সঙ্গে ধর্ষকের প্রেমের সম্পর্ক ছিল।

ধর্ষণের এই ঘটনাগুলির কোনওটিতেই মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের আচরণে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার মনোভাব প্রকাশ পায়নি। সমাজ পরিবেশকে বিষিয়ে তুলছে যে কারণগুলি— যেমন, মদের ঢালাও লাইসেন্স, পর্নোগ্রাফির ছড়াছড়ি, সরকার ও শাসক দলের উচ্চ থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়লেও সে সব না দেখার ভান করে প্রশ্রয় দিয়ে চলা এবং এর মধ্য দিয়ে 'যাকে যা খুশি করতে পারি' মনোভাবকেই প্রশ্রয় দেওয়া— যা প্রকারান্তরে ধর্ষণের মতো ঘটনাকে বাড়িয়ে তুলতেই সাহায্য করছে, এগুলির কোনওটির বিরুদ্ধেই তৃণমূল নেতৃত্বকে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। তা হলে হঠাৎ আর জি করের ঘটনায় পর অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার জন্য সরকার তড়িঘড়ি আইন আনতে গেল কেন?

সরকারের প্রতি জনতার অবিশ্বাস

বাস্তবে ঘটনার শুরু থেকেই সরকারের আচরণ জনমনে প্রশাসন তথা সরকার সম্পর্কে অবিশ্বাসের মনোভাবের জন্ম দিয়েছে। সরকারের একের পর এক পদক্ষেপ সেই অবিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করেছে। আর সরকারের প্রতি এই অবিশ্বাসই জুনিয়র চিকিৎকদের শুরু করা আন্দোলনের পাশে বৃহৎ অংশের মানুষকে এনে জড়ো করেছে। এই ভাবে আন্দোলন অভাবনীয় গতিতে সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে এবং রাজ্য সরকার যে অপরাধীদের আড়াল করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সেই বিশ্বাসও একই ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় প্রবল জনমতের সামনে কোণঠাসা রাজ্য সরকার নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় যতই একের পর এক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে থাকে ততই সেগুলির অন্তঃসারশূন্যতাও প্রকট হতে থাকে।

মহিলাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে 'উদ্বেগ' দেখাতে প্রশাসন প্রথম নির্দেশ দেয়, রাতে যেন মহিলারা কাজে কম বেরোন। যার মানে, মহিলারা যেন নিজেদের নিরাপত্তা নিজেরা বুঝে নেন। এই ভাবে আড়াল করার চেষ্টা করতে গিয়ে প্রশাসন তার অপদার্থতাকেই আরও প্রকট করে তুলল। নতুন বিলে অপরাধীকে দ্রুত এবং কঠোর শাস্তির কথা বলে মৃতুদণ্ডের ঘোষণাও স্বাভাবিক ভাবেই জনমনে কোনও দাগ কাটতে পারেনি। তাই এই নতুন বিলকে কোনও গুরুত্ব না দিয়েই প্রতিদিন আন্দোলন আরও বৃহৎ আকার নিচ্ছে।

এ বার আসা যাক নতুন বিলের কথায়। বিলটিকে পূর্ণাঙ্গ করার থেকেও সেটিকে পাশ করিয়ে তড়িঘড়ি জনসমক্ষে আনাটিই যে মুখ্যমন্ত্রীর মূল লক্ষ্য ছিল বিলের ছত্রে ছত্রে তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। প্রথমত, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন, সমাজ জুড়ে যার গভীর তাৎপর্য রয়েছে, তা নিয়ে আলোচনার কোনও সুযোগই কোনও স্তরে দেওয়া হল না। অত্যন্ত তড়িঘড়ি করে মাত্র একদিনে কয়েক ঘণ্টার মামুলি আলোচনায় এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ করিয়ে নেওয়া হল।

দ্বিতীয়ত, আইনটির মধ্যে নতুন কিছুই নেই। ভারতীয় ন্যায়সংহিতা আইনের কঠোরতাকেই শুধুমাত্র বাড়ানো হয়েছে।

তৃতীয়ত, এই আইনে ধর্ষণে মৃত্যু কিংবা জীবন্মৃতের ঘটনায় বাধ্যতামূলক মৃত্যুদণ্ডের কথা বলা হয়েছে। অথচ ১৯৮৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের 'মিঠু বনাম স্টেট অফ পঞ্জাব' মামলায় শীর্ষ আদালতের পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ রায় দিয়েছিল, আইনে কোনও অপরাধের সাজা হিসাবে যদি একমাত্রই মৃত্যুর সংস্থান থাকে, তবে সেই আইন ভারতীয় সংবিধানের পরিপন্থী। সেই দিক থেকে বিচার করলে এই আইন শেষ বিচারে ধোপে টিকবে কি না সন্দেহ রয়েছে।

আন্দোলন থেকে দৃষ্টি সরাতেই নয়া আইন

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, সমাজে মহিলাদের উপর অপরাধ কমাতে কঠোর শাস্তি প্রয়োজন, এ কথা ঠিক, কিন্তু শুধুমাত্র শাস্তির কঠোরতা দিয়েই কি তা কমানো যেতে পারে? কঠোর আইন এই ধরনের অপরাধ কতটা কমাতে পারে তার বিচার না করেই কি অপরাধীর উপর তা প্রয়োগ করা চলে? বাস্তবে প্রবল গণবিক্ষোভের মুখে পড়ে আইনের কঠোরতা বাড়ানোকেই সরকার যৌন অপরাধের বিরুদ্ধে নিজের দৃঢ়তা প্রমাণের সহজ উপায় বলে মনে করছে। এর দ্বারা সমাজে যৌন হয়রানির আসল কারণকে চিহ্নিত করে তা দূর করার আপাত কঠিন কাজটি থেকে মানুষের

আন্দোলনরত ডাক্তারদের আহ্বানে 'বিচার পেতে আলোর পথে' কর্মসূচি। দক্ষিণ ২৪ পরগণার মৈপীঠ। ৪ সেপ্টেম্বর

দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর তথ্য বলছে, ২০১৮ সালে প্রতি ১৫ মিনিটে দেশে একজন মহিলা ধর্ষিতা হয়েছেন। নির্ভয়া কাণ্ডের পরে প্রবল গণবিক্ষোভের ধাক্কায় আইন বদলেছে, কঠোর হয়েছে সাজা। কিন্তু তার দ্বারা পরিস্থিতি বদল হয়নি। ওই তথ্যই বলছে, ২০২২ সালেও প্রতি ১৫ মিনিটে ধর্ষিতা নারীর সংখ্যাটা একই রয়েছে।

এ কথা কে না জানে, দোষীর মৃত্যুদণ্ড চাওয়া বা আইন হিসাবে তা পাশ করানোর মানে নির্যাতিতাকে বিচার পৌঁছে দেওয়া নয়। বিচারের আগেকার দীর্ঘ পথ— পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা, সাক্ষীর অভাব, সাক্ষীর নিরাপত্তার অভাব, পুলিশের সদিচ্ছার অভাব নির্যাতিতার কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে সব সময়ই দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে সরকার তথা প্রশাসন নির্যাতিতার প্রতি কতটুকু সহানুভূতিশীল ভূমিকা পালন করে, তা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

বিচার নির্ভর করে পুলিশি তদন্তের উপর

তা ছাড়া অপরাধের যাতে সঠিক এবং দ্রুত তদন্ত হয়, তা সুনিশ্চিত করতে সরকারের ভূমিকা কী? সরকার নির্বিশেষে পুলিশের ভূমিকা দলদাসের। পূর্বতন সিপিএম সরকারের আমলেও যা ছিল এখনও তাই। পুলিশ যদি নিরপেক্ষ না হয় কোনও অভিযোগেরই তদন্ত নিরপেক্ষ হতে পারে না। আইন যত কঠোরই করা হোক না কেন, তার শাস্তি তথা বিচার নির্ভর করে পুলিশি তদন্তের উপর। ঢিলেঢালা তদন্তের জন্য বহু সাক্ষ্য হারিয়ে যায়। বিচারপতি তদন্তের উপর নির্ভর করেই রায় দেন। দেখা যাচ্ছে, ধর্ষণ এবং মহিলাদের উপর আক্রমণের যত অভিযোগ ওঠে তার ৩০ শতাংশের কম অভিযোগ প্রমাণ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, শাস্তি তো তার পরের ব্যাপার। তাই দণ্ডে কঠোরতার উপর সরকারের এত জোর পুলিশ তথা প্রশাসনের 'জো হুজুর' ভূমিকাকে আড়াল করার আর এক ছল বলেই আন্দোলনে যুক্ত মানুষের ধারণা। তাই পুলিশের নিরপেক্ষতা আন্দোলনের অন্যতম দাবি।

চাই বৃহত্তর সামাজিক সংস্কার

এই অবস্থায় সত্যিই মহিলাদের উপর নিগ্রহ এবং ধর্ষণের মতো ঘটনাকে আটকাতে গেলে যেমন প্রয়োজন প্রশাসনিক নজরদারি, শক্তিশালী ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা, তেমনই প্রয়োজন বৃহত্তর সামাজিক সংস্কার। এই সামাজিক সংস্কার মানে সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়কেই সমান দৃষ্টিতে দেখতে শেখা। সমাজ বিকাশে নারী ও পুরুষ উভয়ের ভূমিকা যে সমান এবং নারী বা পুরুষ নয়, উভয়েরই প্রথম পরিচয় মানুষ, এই শিক্ষাটার আজ বড় প্রয়োজন। আর এই শিক্ষাটা একেবারে ছোট থেকেই শুরু হওয়া দরকার। অধিকাংশ পরিবারেই শিশুরা শৈশব থেকেই শেখে মহিলারা পুরুষের থেকে সব দিক দিয়েই পিছিয়ে। মহিলামাত্রেই ভোগের সামগ্রী। মহিলারা যে সব দিক থেকেই পুরুষের সমান ক্ষমতার অধিকারী— এই শিক্ষাটাই গড়ে ওঠে না। তাই মহিলাদের সম্মান দিতে, মর্যাদা দিতে তারা শেখে না। বরং অনেক সময়ই একটা বিদ্বেষের মনোভাব গড়ে ওঠে। এমনকি বড় বড় ডিগ্রিধারীরাও নিজেদের ক্ষমতা বোঝাতে হামেশাই উল্লেখ করেন যে, তাঁরা চুড়ি পরে থাকেন না। টিভি সিরিয়ালগুলোতে অধিকাংশ নারী চরিত্রকেই দেখানো হয় বস্তাপচা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, পুরুষের নির্দেশে চলা কিছু পুতুল হিসাবে। ব্লেডের বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে মোবাইল ফোনের বিজ্ঞাপনে পর্যন্ত নারী দেহ প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে নারীকে ভোগের বস্তু হিসাবে তুলে ধরা হয়। মুখ্যমন্ত্রী কি পারবেন সমাজের এমন মনোভাব পাল্টানোর ব্যাপারে এতটুকুও উদ্যোগী হতে?

বাস্তবে মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রশাসনকে যদি এ ব্যাপারে এতটুকুও সক্রিয় করতে হয় তবে আন্দোলন থামালে চলবে না, বরং তা প্রবল ভাবে জারি রাখতে হবে। এবং সেই আন্দোলনকে স্বতঃস্ফূর্ততার জায়গায় ফেলে না রেখে তাকে সংগঠিত রূপ দিতে হবে, আন্দোলনের মধ্যে সমাজ বদলের লক্ষ্যকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যুক্ত করতে হবে সাংস্কৃতিক কর্মসূচিকে। আপসহীন আন্দোলন জনসাধারণের মধ্যে নতুন নৈতিকতার জন্ম দেয়, হারিয়ে যাওয়া নৈতিকতাকে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস চালায়। এ কথা মনে রাখতে হবে, নবজাগরণ এবং স্বাধীনতা আন্দোলন সমাজে যে চেতনা এবং সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল, শাসকদের অবহেলা, উদাসীনতা এবং ক্রমাগত আক্রমণে তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়েছে। গণআন্দোলন থেকেই সেই অর্জিত চেতনা ও সংস্কৃতিকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। একমাত্র শক্তিশালী চেতনা ও সংস্কৃতিই পারে একদিকে যেমন সমাজে মহিলাদের সম্পর্কে মনোভাবকে বদলাতে, তেমনই শাসকদেরও বাধ্য করে সজাগ প্রশাসনিক নজরদারি ও বিচারপ্রক্রিয়াকে যথাযথ ভাবে পরিচালিত করতে। না হলে প্রবল আন্দোলনের চাপে একটা ধর্ষণ-খুনের বিচার আদায় হলেও ঠিক একই সময়ে আরও বিশটা এমন ঘটনা ঘটে যাবে, ঘটতে থাকবে।

প্রতিবাদের ভাষা, প্রতিবাদের সংস্কৃতি

৪ সেপ্টেম্বর এর রাত। জুনিয়র ডাক্তারদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে শহর, গ্রাম সামিল হয়েছে 'বিচার পেতে আলোর পথে' কর্মসূচিতে। আর জি কর-এর নির্যাতিতার ধর্ষক-খুনিদের শাস্তি চেয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে মোমবাতি হাতে রাস্তায় নেমেছেন মানুষ, শহর-মফস্বলের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে হাজার হাজার মানুষের জমায়েত, মানববন্ধন। সিঁথির মোড়ের এমনই একটি জমায়েতে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান দিতে দিতে নাচের তালে শরীর দোলানোর মতো ভঙ্গি করছিলেন কয়েকজন, কিছুটা অজান্তেই। ভিড়ের মধ্যে থেকে এগিয়ে এসে মাইক হাতে নিলেন একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ। বললেন, 'একটা কথা বলি বন্ধু। তিলোত্তমার জন্য আমরা সোচ্চারে বিচার চাইব, শেষ পর্যন্ত লড়ব, রাজপথের দখল নেব। কিন্তু শরীর দুলবে না। মনে রাখবেন, এ আমাদের কঠিন প্রতিজ্ঞার লড়াই।' একটু থেমে পাল্টে গেল ভঙ্গি, পাশে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধা বললেন, 'একদম ঠিক কথা বলেছ বাবা।' হয়তো সামান্য ঘটনা, কিন্তু স্মরণীয় ঘটনা। মনে পড়ে যায়, ১৪ আগস্ট প্রথম রাত দখলের দিন প্রতিবাদী মানুষ নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এই কর্মসূচিতে সেলফি তুলে পোস্ট করবেন না কেউ, পরেও মূলত অব্যাহত থেকেছে সেই ধারা। ন্যায্য দাবিতে সংগঠিত লড়াই-আন্দোলন যেমন শাসককে মাথা নত করতে বাধ্য করে, তেমনই যে মানুষগুলো আন্দোলনের ময়দানে আসে, তাঁদেরও পাল্টে দেয়। মানুষ যখন আরও সহস্র মানুষের সাথে হকের দাবি জানায়, প্রতিদিনের গতানুগতিক জীবনের নিশ্চিন্ত ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে অপরিচিত মানুষের সাথে হওয়া অন্যায়ের বিচার চায়, তখন সেই পরিবেশ তাঁকেও অনেকটা পাল্টে দেয়, বহু কিছু শিখিয়ে দিয়ে যায়। আর জি কর-এর ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠা এই আন্দোলনও তার ব্যতিক্রম নয়।

বহুদিন পর এই শহর, রাজ্য দেখছে এক অভূতপূর্ব গণজাগরণ। দিনের পর দিন, প্রতিদিন পথে নামছেন মানুষ। নিজেরাই বিক্ষোভ-অবস্থান-প্রতিবাদ সংগঠিত করছেন। খুঁজে নিচ্ছেন প্রতিবাদী মিছিল। পাড়ার মোড়ে, চায়ের দোকানে, স্কুল-কলেজে-অফিস-আদালতে একটাই প্রশ্ন, একটাই আলোচনা —'তদন্ত কি এগোচ্ছে ঠিকপথে? বিচার মিলবে তো?' উত্তরও সাধারণ মানুষই খুঁজে পেয়েছেন জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই। 'রাস্তাই একমাত্র রাস্তা'। রাস্তা ছাড়লে, আন্দোলনের পথ থেকে সরে এলেই সরকার-পুলিশ-প্রশাসন আরও দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়বে অপরাধীদের আড়াল করতে। নিজেদের অপদার্থতা ঢাকতে হাজার ফন্দি-ফিকির-প্রলোভনে ভুলিয়ে দিতে চাইবে এই ঘটনার ভয়াবহতা। মানুষ তাই কোনওভাবেই ভুলছেন না, রাস্তা ছাড়ছেন না। প্রতিবাদের নানা নতুন মাধ্যম, সৃজনশীল স্লোগান-গান-কবিতা যেমন তৈরি হচ্ছে, তেমনই মানুষ শিখছেন এবং স্পষ্ট করে বলছেন, এই বিপুল শোককে দ্রোহে রূপান্তরিত করার সময় কোন আচরণ করা চলে বা চলে না। বুদ্ধিজীবীদের একটি মিছিলে সামিল হওয়ার সময় চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব অপর্ণা সেনের উদ্দেশ্যে কুরুচিকর মন্তব্য করা হচ্ছিল পাশের একটি রাজনৈতিক দলের মঞ্চ থেকে। সাধারণ মানুষ তার নিন্দা জানিয়ে প্রতিবাদ করেছেন। এই দীর্ঘ এক মাস ব্যাপী গণআন্দোলন তীব্র, একমুখী অথচ প্রধানত সংযত এবং পরিশীলিত থেকেছে এই সচেতনতার কারণেই। ঘোলা জলে মাছ ধরে আখের গোছাবে ভেবেছিল যারা, সেই ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দলগুলোও সুবিধা করতে পারেনি। রাজ্যে রাজ্যে প্রবল অপশাসন, স্বৈরতন্ত্র এবং নারী নির্যাতনের কান্ডারী যারা, সেই বিজেপি'র স্বার্থসন্ধানী, সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন মানুষ। আর জি করের পাশাপাশি বারবার উঠে এসেছে উন্নাও, হাথরস, গুজরাট, মহারাষ্ট্রের নাম। আবার সিপিএমের রাজ্য সম্পাদককে তাঁদের সমাবেশে আসা এক মহিলাই প্রশ্ন করেছেন, 'আপনারা রাজনীতির দলাদলির কথা বলছেন কেন? বিচারের কথা বলুন।' তিলোত্তমার ন্যায়বিচারের দাবি থেকে আন্দোলন যাতে এক চুলও না সরে, এ ভাবেই সজাগ থাকছেন মানুষ। অন্যদিকে একটি নামকরা সংবাদমাধ্যমে বক্তব্য রাখতে এসে আর জি করের এক আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তার যখন দুর্নীতি সহ বহু অভিযোগে অভিযুক্ত অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের সাসপেনশনের দাবি জানানোর সময়ও তাঁর নামের পরে 'স্যার' যুক্ত করেছেন, এই সৌজন্যবোধ শ্রদ্ধা আদায় করেছে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক-দর্শক শ্রোতাদের।

প্রতিবাদ-আন্দোলনের আবহে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নও উঠে আসছে সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকেই। মূল্যবোধের প্রশ্ন, সংস্কৃতির প্রশ্ন। কেন চারিদিকে এত ধর্ষণ-হত্যা-বর্বরতা? শাস্তি দিয়ে একজন, পাঁচজন ধর্ষককে সরানো গেল, কিন্তু প্রতিদিন যে নতুন করে আরও ধর্ষক তৈরি হচ্ছে সমাজে, বাড়ছে অপরাধ, মানুষ অমানুষে পরিণত হচ্ছে, তার কী হবে? সচেতন মানুষ টের পাচ্ছেন, আমাদের সময়, সমাজ, জীবনধারাকে গ্রাস করেছে এক চরম অন্তঃসারশূন্যতা, মূল্যবোধের সংকট। এক সময় আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের আধার ছিল যে উন্নত রুচি-সংস্কৃতি-মূল্যবোধ, স্বাধীন ভারতে মূল ধারার রাজনৈতিক দলগুলির প্রায় কেউই সেই উন্নত সংস্কৃতির চর্চা করেনি, এমনকি 'কমিউনিস্ট' নামধারী বড় বড় দলগুলোও নবজাগরণ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের বড় চরিত্রগুলির সাথে যোগসূত্র রক্ষা করার চেষ্টা করেনি। এ দেশের বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী দার্শনিক শিবদাস ঘোষ এই ত্রুটি নির্দেশ করে বলেছিলেন, 'আমরা ছিন্নমূল হয়ে পড়েছি।' আজ তারই ভয়ানক মাশুল দিতে হচ্ছে এই সমাজ, সভ্যতাকে। তাই আর জি করের সুবিচার চাইতে গিয়ে উঠে আসছে প্রীতিলতা, মাতঙ্গিনী, ক্ষুদিরামের নাম। মিছিলে প্ল্যাকার্ড দেখা যাচ্ছে, 'পুরুষ চাই তেমন, বিদ্যাসাগর ছিলেন যেমন।' এইভাবে আন্দোলনের প্রবাহেই মানুষ খুঁজে নিচ্ছেন সেই স্মরণীয় উত্তরাধিকার, ফিরে চাইছেন হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধ। এ পথেই সঠিক রাজনীতি, সংগ্রামী রাজনৈতিক দলকেও মানুষ চিনে নেবেন একদিন, গোটা দেশের তিলোত্তমাদের বাঁচাতে সামিল হবেন সমাজ পরিবর্তনের মিছিলে।

মুসলিম হলেই হত্যা করা যায়!

গো-রক্ষকদের কাছে প্রশ্ন পুত্রহারা পিতা-মাতার

হরিয়ানায় বিধানসভা ভোট আসতেই আবার গো-রক্ষক বাহিনীকে মদত দিয়ে রাস্তায় নামিয়েছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি-আরএসএস। তাদের আক্রমণের একেবারে সাম্প্রতিক শিকার ২০ বছরের স্কুল ছাত্র আরিয়ান মিশ্র।

আরএসএস-বিজেপির অন্যতম সহযোগী বজরং দলের বাহিনী হরিয়ানার ফরিদাবাদে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে ২৩ আগস্ট। গরু পাচারকারী সন্দেহে তার গাড়িকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার ধাওয়া করে বজরং দলের গো-রক্ষক বাহিনীর নেতা অনিল কৌশিক তাকে গুলি করে খুন করেছে।

আরিয়ানের পরিজন বাড়ির সামনে তার ছবি সহ ফ্লেক্স ঝুলিয়ে লিখেছেন, 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'— আর জি কর আন্দোলনের আবহে যে দাবি এখন বিশ্বজুড়ে জনগণের দাবিতে পরিণত হয়েছে, সেই দাবির প্রতিধ্বনি সেখানেও।

ধরা পড়ার পর খুনি অনিল কৌশিক স্বীকার করেছে, মুসলিম সন্দেহে সে খুনটা করেছে। যা শুনে সন্তান হারানো আরিয়ানের বাবা গুরুতর প্রশ্নটি তুলেছেন, মুসলিম হলেই কি খুন করা যায়? ওদের কি বাঁচার অধিকার নেই? তার মা ওই খুনিকে প্রশ্ন করেছেন, মুসলিমরা কি তোমার ভাই নয়!

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গোল্ড মেডেলিস্ট ছাত্র অনিল কৌশিকের খুনি হয়ে ওঠার পিছনে রয়েছে কোন সে চরম বিদ্বেষী চিন্তাভাবনা? কে তাকে বানালো এমন ঠাণ্ডা মাথার নৃশংস খুনি? এই ঘটনার মাত্র কয়েক দিন পরের আর একটি ঘটনার দিকে তাকালে অবশ্য কারণটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। হরিয়ানাতেই চরখি দাদরি এলাকায় ২৭ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের এক পরিযায়ী শ্রমিক সাবির মালিককে গোমাংস খাওয়ার অভিযোগ তুলে পিটিয়ে হত্যা করেছিল এই গো-রক্ষক বাহিনী। তার আর এক সঙ্গী গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। তাদের প্রতিবেশী এক যুবককে তার আগের দিনই পুলিশ একই রকমভাবে গো-মাংস ঘরে রাখার অভিযোগে থানায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল, না হলে সেও সাবিরের পাশে হয়ত এতদিনে জায়গা নিত। হরিয়ানায় বিজেপি শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ চরমে উঠছে। তার উপর ধারাবাহিক কৃষক আন্দোলন বিজেপিকে আরও বিপাকে ফেলেছে।

ফলে সরকারি মদতে তারা এখন গো-রক্ষক বাহিনীকে নামিয়ে গুরগাঁও রোহতক হাইওয়েতে কার্যত পাহারা বসিয়েছে। কখনও গাড়ি থামিয়ে, কখনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের বাড়ির রান্নাঘরে পর্যন্ত হামলা চালিয়ে তারা তথাকথিত গো-রক্ষার পবিত্র কর্মটি করে চলেছে। পুলিশ সব জেনেও চুপ। পরপর হত্যাকাণ্ডে তারা শুধু বলেছে— আমরা তো খবর দিতে বলেছিলাম— ওরা একেবারে মেরে ফেলবে ভাবিনি! অর্থাৎ পুলিশের মদতেই এই সব চলছে তা পরিষ্কার। অন্যদিকে, সাধারণ মানুষ কী বলছেন? সাবিরকে পিটিয়ে মারার পর সাংবাদিকরা তাদের বস্তির আশেপাশে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষদের সাথে কথা বলতে গিয়ে দেখেছেন, তাঁরা বিজেপি সরকারের এই ধরনের কাজের তীব্র বিরোধী।

পুলিশ এবং গো-রক্ষকরা এই সাহস কোথা থেকে পেয়েছে? বোঝা যায় যখন সাবিরের মৃত্যুকে কার্যত সমর্থন করে বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনি বলেন, গ্রামবাসীরা গরুকে সম্মান করে, তাদের রুখবে কে? (বিজনেস টুডে, ৩১ আগস্ট ২০২৪) এটাই নাকি বিজেপি কথিত আইনের শাসন? প্রধানমন্ত্রীর সংবিধানে মাথা ঠেকানো তা হলে এ জন্যই যে তাঁর দলের মুখ্যমন্ত্রী একজনের খুনকে খোলাখুলি সমর্থন জানাবেন? এরপর অনিল কৌশিকদের খুনি হয়ে ওঠার জন্য আরএসএস-বিজেপিকে দায়ী করা কি খুব ভুল হবে?

২০১৫ সালে হরিয়ানার বিজেপি সরকার গরুপাচার, গোহত্যা এবং গোমাংস বিক্রি নিষিদ্ধ করে আইন করেছে। এটা কি পশুপ্রেমের কোনও বিষয়? তা যদি হত তাহলে উত্তরপ্রদেশ হরিয়ানা, রাজস্থানের মতো রাজ্যে বেওয়ারিশ গবাদি পশুতে রাস্তা ছেয়ে যেত না। উত্তরপ্রদেশে বিজেপি সরকারের বহুল প্রচারিত গোশালাতে শত শত গবাদি পশুর অবহেলায় মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটত না। আসলে এর পিছনে বিজেপির ভোটের সময়ে তোলা হিন্দুত্ববাদী সেন্টিমেন্টের হিসাব ছাড়া আর কিছুই নেই।

গরুকে দেবতা হিসাবে পুজো করার চল যেমন হিন্দুদের মধ্যে দেখা যায়, তেমনই মুসলমান কৃষকের, দুধ ব্যবসায়ীর ঘরে গরুর যত্ন কিছু কম হয় না। কিন্তু আজকের দিনে কৃষিকাজে গরুর ব্যবহার কমছে। ফলে দুধ দেওয়ার বয়স শেষ হওয়ার পর তাকে বিক্রি করতে না পারলে সাধারণ পরিবারের পক্ষে গরু পোষার খরচ সামলানো মুশকিল হয়ে পড়ে। যে কারণে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে গরুদের দুর্দশা বেশি বাড়ছে। অথচ ইউরোপ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া যেখানে মাংস এবং দুধ উভয়ের জন্যই গো-পালন হয়, সেখানে গরুর প্রজাতির উন্নতি ও তাদের যত্ন তথাকথিত গো-পূজক বিজেপি শাসিত রাজ্য থেকে অনেক গুণে বেশি।

অন্য দিকে বেশ কিছু বিজেপি ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী মোষের মাংস বিশ্ব বাজারে রপ্তানি করে কোটিপতি হয়েছেন। অথচ দেশের মধ্যে মুসলিম, খ্রিস্টান সহ নানা আদিবাসী, দলিত সম্প্রদায়ের মধ্যে গো-মাংস খাদ্য হিসাবে গ্রহণীয় হলেও বিজেপি সেখানেও দাদাগিরি চালাচ্ছে। যেমন তারা উত্তর ভারতে এবং অন্যত্রও সমস্ত ধরনের আমিষভোজী জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নানা প্রচার চালাতে শুরু করেছে। এমনকি কোনও কোনও মাসে মাছ খাওয়ার বিরুদ্ধে খোদ বাংলা ও আসামেও বিজেপি ফতোয়া দিচ্ছে। মানুষের স্বাভাবিক খাদ্যভাসের বিরুদ্ধে জিগির তুলে বিজেপি আরএসএস-এর অভ্যাসকেই একমাত্র বলে চাপিয়ে দিতে চাইছে তারা।

হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষকে ভেবে দেখতে হবে, ধর্মের অজুহাতে এই ধরনের স্বৈরাচার চলতে দিলে তা সব ধরনের অধিকারের গলা টিপে ধরার রাস্তা করে দেবে না কি?

মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্মেলন

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ১ সেপ্টেম্বর কলকাতার সুবর্ণ বণিক সমাজ হলে সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কর্মীরা কর্মক্ষেত্রে তাঁদের শোষণ বঞ্চনার কথা তুলে ধরেন। তাঁরা বারো মাস কাজ করলেও বেতন পান দশ মাসের, তাও মাত্র ২০০০ টাকা। সেই টাকাও পঞ্চায়েত এলাকাগুলোতে গ্রুপে ভাগ করে নিতে হয়। ফলে হাড়ভাঙা পরিশ্রমেও সংসার চালাতে পারেন না। সাংসদ বিধায়কদের ভাতা বৃদ্ধি হলেও তাঁদের পারিশ্রমিক না বাড়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা। দীর্ঘ বঞ্চনার প্রতিবাদে ১১ বছর ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলে সরকার মাত্র ৫০০ টাকা মজুরি বৃদ্ধি করেছে।

সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন, পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের সভানেত্রী রুনা পুরকায়েত, ওয়েস্টবেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা মাধবী পণ্ডিত বক্তব্য রাখেন। মিড-ডে মিল কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি, পেনশন প্রকল্প চালু, সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশন-এর উপদেষ্টা অধ্যাপিকা অনুরূপা দাস এবং এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস। সুনন্দা পণ্ডাকে সভানেত্রী, নীলাঞ্জনা কর ও মনোরমা হালদারকে যুগ্ম সম্পাদক এবং শিবানী মজুমদারকে অফিস সম্পাদক করে ৭৪ জনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

ই-রিক্সা চালক ইউনিয়নের দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন

সারা বাংলা ই-রিক্সা টোটো চালক ইউনিয়নের দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার সুবর্ণ বণিক সমাজ হলে ৪ সেপ্টেম্বর। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে তিন শতাধিক চালক প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। প্রধান বক্তা ছিলেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস।

সম্মেলনে আর জি করের ন্যাক্কারজনক ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে প্রস্তাব পাশ করা হয়। অংশুধর মণ্ডলকে সভাপতি ও শ্যামল রামকে সম্পাদক করে ৫৩ জনের কমিটি গঠন করা হয়।

এআইইউটিইউসি-র পুরুলিয়া জেলা সম্মেলন

১ সেপ্টেম্বর এআইইউটিইউসি-র একাদশতম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রঘুনাথপুরের বরাট হলে। বিভিন্ন সংগঠিত শিল্প, যেমন রঘুনাথপুর থার্মাল পাওয়ার স্টেশন (ডিভিসি), আনারা রেলওয়ে স্লিপার, সানতালডি থার্মাল পাওয়ার স্টেশন, স্পঞ্জ আয়রন আনলোডিং, কয়লা, ভুজুডি কোল ওয়াশারি, রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন ও সংবহন কোম্পানি, সিমেন্ট কারখানা, বিড়ি, মুটিয়া মজদুর সহ বিভিন্ন সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে আসা কর্মীদের পাশাপাশি আশাকর্মী, আইসিডিএস, সিএসপি প্রভৃতি স্কিম কর্মীরাও সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে মোট ২৭০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং শ্রমিক নেতা কমরেড নবনী চক্রবর্তী। রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করেন জেলা সম্পাদক কমরেড প্রবীর মাহাতো। প্রতিবেদনের উপর মোট ২৩ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন।

আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় ওয়ার্কিং কমিটির কমিটির সদস্য এবং রেল ও বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের বিশিষ্ট নেতা কমরেড নিরঞ্জন মহাপাত্র এবং মানস সিনহা। প্রধান বক্তা ছিলেন এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সমর সিনহা।

বক্তারা কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের চূড়ান্ত শ্রমিক স্বার্থবিরোধী চারটি শ্রম কোডের বিপজ্জনক দিকগুলি উল্লেখ করেন। তাঁরা বলেন, শ্রমিক-কর্মচারীদের দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পেনশন সহ অর্জিত নানা অধিকার কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি একে একে কেড়ে নিচ্ছে। হাজার হাজার স্থায়ী পদের অবলুপ্তি ঘটছে। স্থায়ী কাজে ক্রমাগত বাড়ছে ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ। বাস্তবে শ্রম আইন লঙ্ঘন বর্তমানে মহামারীর রূপ নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলোর শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতি ও পদক্ষেপগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। কমরেড নবনী চক্রবর্তীকে সভাপতি, প্রবীর মাহাতোকে সম্পাদক এবং তপন রজককে কোষাধ্যক্ষ করে ৩৩ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

নাবালিকাকে যৌন হেনস্থা ঃ প্রতিবাদ হাওড়ায়

সম্প্রতি ১৩ বছরের এক কিশোরীকে হাওড়া হাসপাতালের এক্স রে রুমে যৌন হেনস্থা করে এক যুবক। এর প্রতিবাদে ৫ সেপ্টেম্বর হাসপাতাল সুপারকে ডেপুটেশন দেয় এসইউসিআই(সি)-র এক প্রতিনিধিদল। ছিলেন দলের জেলা সম্পাদক কমরেড সৌমিত্র সেনগুপ্ত, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড শ্রীরূপ দাস, টাউন লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড মিতা হোড়।

বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলন

● **দার্জিলিং-এ গ্রাহক অবস্থান ঃ** স্মার্ট মিটার বাতিল ও বিদ্যুতের দাম কমানোর দাবিতে দার্জিলিং জেলায় শিলিগুড়ির হাশমি চকে গ্রাহক অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয় ও ১৯ সেপ্টেম্বর কলকাতায় আইন অমান্য সফল করার আহ্বান জানানো হয়।

● **বাঁকুড়ায় সভা ঃ** বর্ধিত মিনিমাম চার্জের বোঝায় বাঁকুড়ার মানুষের রুজি-রোজগার ব্যাহত হচ্ছে। ক্ষুদ্রশিল্পকে কেন্দ্র করে যতটুকু কাজকর্মের সুযোগ তৈরি হচ্ছিল, তা ধ্বংস হয়ে পড়ছে। আটাকল, ধানকল, গমকলে বিদ্যুতের লাইন কাটা পড়ছে। কৃষিবিদ্যুৎ গ্রাহকদের অবস্থাও শোচনীয়। কোম্পানি সামান্য বাঁশের খুঁটি পাল্টাতে পারছে না, অথচ লোকলস্কর নিয়ে স্মার্ট মিটার লাগানোর জবরদস্তি চালিয়ে যাচ্ছে।

এই অবস্থার প্রতিকারে ৫ সেপ্টেম্বর বাঁকুড়ার কোতুলপুরের লেদ হলে কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প ও গৃহস্থ সহ সর্বস্তরের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের নিয়ে অ্যাবেকার আহ্বানে একটি সভা হয়। গ্রাহকরা তাদের অবর্ণনীয় দুর্দশা তুলে ধরেন। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস। আন্দোলনের ফলে যে তিনটি দাবি আদায় হয়েছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে বলেন তিনি। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক স্বপন নাগ ও ব্লক সম্পাদক গোবিন্দ ঘোষ।

ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের তৃতীয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন

১ সেপ্টেম্বর ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের তৃতীয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কলকাতার তারাপদ মেমোরিয়াল হলে। দেড় শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বিশেষ অতিথি হিসাবে এআইইউটিইউসি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড অশোক দাস সম্মেলনের সূচনা করেন। প্রধান বক্তা ছিলেন অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের সভাপতি কমরেড পূর্ণচন্দ্র বেহেরা ও সাধারণ সম্পাদক কমরেড জগন্নাথ রায়মণ্ডল। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড আইসানুল হক। কমরেড বঙ্কিমচন্দ্র বেরাকে সভাপতি, কমরেড গৌরীশঙ্কর দাসকে সাধারণ সম্পাদক করে ৪৩ জনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

রানাঘাটে রক্তদান শিবির ও মেডিকেল ক্যাম্প

২৫ আগস্ট হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠন ও মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের পক্ষ থেকে রানাঘাট পৌরসভা লনে আরজি করের নৃশংস ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে প্রতিবাদ সভা হয়। বক্তব্য রাখেন রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাঃ প্রসাদ অধিকারী, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের নদীয়া জেলা সম্পাদক ডঃ অপূর্ব রায় এবং সভাপতি ডঃ সত্যজিৎ রায় এবং গ্রামীণ ডাক্তার সংগঠনের জেলা সম্পাদক লক্ষ্মণ শর্মা প্রমুখ। এ ছাড়াও মেডিকেল ক্যাম্প ও রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

শিক্ষার বেসরকারিকরণ, ফি বৃদ্ধি রদ ও নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে ছত্তিশগড়ের বিলাসপুর জেলা দ্বিতীয় ছাত্র সম্মেলন। ৩ সেপ্টেম্বর

শপথে উজ্জ্বল ‘অভয়ার রাত’

৪ সেপ্টেম্বর রাত। বিচার পেতে আলোর পথে

তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। উপস্থিত দলের রাজ্য সম্পাদক ও প্রাক্তন সাংসদ

বেলঘরিয়া, উত্তর ২৪ পরগণা

একের পাতার পর

রেহাই পায়নি সাড়ে চার বছরের শিশুও। কানে এসেছে উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লির একাধিক ধর্ষিতা নারীর অসহায় আর্তনাদ। মানুষের স্মৃতিতে জেগে আছে ১৯৯০-এ সিপিএম শাসনে বানতলায় তিন স্বাস্থ্যকর্মী সহ ইউনিসেফের অফিসার অনিতা দেওয়ানের ধর্ষণ ও তাঁর হত্যার ঘটনা। তাঁদের বাঁচাতে গিয়ে সেদিন নিহত হয়েছিলেন তাঁদের গাড়ির ড্রাইভারও। সেদিনের মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে দিয়েছিল, প্রকৃত বিচার তাঁরা দিতে চান না। সে দিনও স্বাস্থ্যব্যবস্থার দুর্নীতির সাথে এই হত্যা ও ধর্ষণ যুক্ত বলে অভিযোগ ছিল, তার কোনও তদন্ত হয়নি। ২০০৩-এ নদীয়ার ধানতলায় দুটি বাসের দুই ড্রাইভারকে হত্যা করে এক সাথে প্রায় ৩৫ জন মহিলার শ্লীলতাহানি ও অনেককে ধর্ষণ করার ঘটনাতেও মাত্র চারজনের সামান্য শাস্তির ঘটনা ভোলা যায় না। সে দিন সিআইডির আইনজীবী বলেছিলেন, সাক্ষীদের ৯০ শতাংশই ভয় পেয়ে আদালতে মূল অভিযুক্ত শাসক দলের নেতাদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাননি। এর পরেও দিদির শ্লীলতাহানি রুখতে গিয়ে বারাসাতের রাজীবের মৃত্যু, সরকার বদলের পর পার্কস্ট্রিটের ধর্ষণ, কামদুনির কলেজ ছাত্রীর মর্মান্তিক পরিণতি, হাঁসখালি, মধ্যমগ্রামের ঘটনা— একের পর এক চলতেই থেকেছে। অন্য রাজ্যেও, যেমন উত্তরপ্রদেশের হাথরস, উন্নাও, জম্মুর কাঠুয়া— যেখানে কেন্দ্রীয় শাসক দল বিজেপি দাঁড়িয়েছে ধর্ষক-খুনিদের পক্ষে। এর যেন শেষ নেই! এ যেন সেই ১৯৯০-এর বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর ভয়ানক উচ্চারণ— ‘এমন তো কতই হয়’! বিচার না পাওয়াটাই যেন স্বাভাবিক!

ঠিক এখানেই আঘাত করেছে আর জি কর আন্দোলন। ‘আমার বোনের বিচার চাই’ বলছে যে মেয়েটি বা ঠিক তার পাশে দাঁড়ানো ছেলেটি, তাদের চোখে আশার বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে যায়— বিচারের দাবি তারা আদায় করবেই। ওই নির্যাতিতা, নিহত মেয়েটি তাদের সকলের আত্মীয় হয়ে উঠেছে। এক একটা প্রতিবাদী আন্দোলন কখনও কখনও ঘটে যাওয়া সমস্ত অন্যায়ের প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে ওঠে। আর জি কর আন্দোলন আজ সেই ভূমিকাই পালন করছে। বহু দিনের সঞ্চিত ক্ষোভ আজ ভাষা পেয়েছে এই আন্দোলনে। এই আন্দোলন একটার পর একটা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ১৪ আগস্ট রাত দখল কর্মসূচিতে সমস্ত গণ্ডি ভেঙে মানুষ লাখে লাখে রাস্তায় নেমেছেন। সরকার আন্দোলন থেকে ছাত্রদের দূরে রাখার জন্য নির্দেশিকা জারি করলে তা অমান্য করে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে মিছিলে হেঁটেছেন তাদের শিক্ষক শিক্ষিকারা। জুনিয়র ডাক্তাররা লালবাজারে কলকাতা পুলিশের হেড কোয়ার্টারের অদূরে রাস্তায় ২২ ঘন্টা বসে থেকেছেন অবিচল দৃঢ়তায়। তাঁদের শিরদাঁড়ার জোরটা বোঝাতে কলকাতার নগরপালের টেবিলে তার একটি প্রতিলিপিও তাঁরা দিয়ে এসেছেন। মানুষ অক্লান্ত— শেষ দেখে ছাড়ার জেদে তাঁরা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত।

যদিও আন্দোলনের কেন্দ্রে থাকা জুনিয়র ডাক্তারদের উপলব্ধি— সাধারণ মানুষ এই আন্দোলনের প্রকৃত সুরটাকে গ্রহণ করতে পারলেও ভোটসর্বস্ব রাজনীতিবিদ ও তাঁদের দলগুলো তা বুঝতে একেবারে অক্ষম। তাই তারা বিচারের দাবির অভিনয় করলেও নজরটা থেকে যাচ্ছে গদির দিকেই। চলছে তাঁদের অশ্লীল কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি। অন্য দিকে সাধারণ মানুষের দফা এবং দাবি এক— বিচার চাই। রাজ্য সরকারের পুলিশের প্রমাণ চাপা দেওয়ার জন্য ন্যক্কারজনক ভূমিকার জন্য তাঁরা ধিক্কার জানাচ্ছেন যেমন, একই সাথে সিবিআইয়ের ঢিলেঢালা মনোভাব, আদালতের দীর্ঘসূত্রতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে তাঁরা পিছপা নন। যে সিবিআই সারদা, নারদা থেকে শুরু করে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বছরের পর বছর ধরে কার্যত একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছে। দুর্নীতিতে অভিযুক্ত কোনও নেতা বিজেপিতে নাম লেখানো মাত্র যে সিবিআইয়ের চোখে অদৃশ্য হয়ে যান, উত্তরপ্রদেশের হাথরসে সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করতে অতি তৎপর অথচ দোষীদের শাস্তি দিতে অক্ষম যে সিবিআই— তাদের হাতে তদন্তের ভার ছেড়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকা সম্ভব কি! আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তাররা দাবি করেছিলেন, তদন্ত হোক বিচারবিভাগের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট বিষয়টি গ্রহণ করতে অনেকেই খুশিও হয়েছেন। কিন্তু যখন এই মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীরা পর্যন্ত জানাচ্ছেন, শীর্ষ আদালতের মূল মাথাব্যথা হল দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়া আন্দোলনকে একটু সংযত করা, ডাক্তারদের কাজে ফেরানো (আনন্দবাজার পত্রিকা ৬.০৯.২৪), তখন যেন মনের কোণে সন্দেহ ঝিলিক দিয়ে যায়। ৯ সেপ্টেম্বরের শুনানিতেও ডাক্তারদের আন্দোলন তুলে নেওয়ানোই যেন বিচারব্যবস্থার একমাত্র মাথাব্যথা হিসাবে দেখা গেছে। আবার একটি দিন ছাড়া কিছুই মেলেনি। ধাক্কা খেয়েছে মানুষ। তবে কি আবার সেই বিচারহীনতার পুনরাবৃত্তি! সুপ্রিম কোর্ট কিংবা হাইকোর্ট কালকেই বিচার শেষ করে দেবে এমন অবাস্তব দাবি মানুষ করেনি। বিচারের দাবি তুলে রাস্তায় নামা মানুষের চাহিদা খুব সামান্য— আদালত এবং তদন্তকারী সংস্থা সত্য উদঘাটনে তাদের সদর্থক ভূমিকাকে স্পষ্ট করুক। রাষ্ট্রের কর্ণধার, প্রশাসন, বিচারবিভাগের কাছে মানুষের এটুকু চাওয়াও কি অনেক বেশি!

আর জি করের মহিলা চিকিৎসকের মূল্যবান জীবনের মর্মান্তিক পরিসমাপ্তি যে ব্যথা যন্ত্রণা মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে তারও মূল্য অনেক। এ জন্যই হরিয়ানার স্বঘোষিত গো-রক্ষকদের হাতে নিহত আরিয়ান মিশ্রের পরিজন বাড়ির দরজায় ব্যানার ঝুলিয়েছেন— উই ওয়ান্ট জাস্টিস। যে মানুষটা এতদিন মিছিল দেখলে বিরক্তি প্রকাশ করতেন, প্রতিবাদের থেকে শত হস্ত দূর থাকতেন, তিনিও আজ কোনও না কোনও পাড়ায় রাত জাগছেন। যে খবরের কাগজ মিছিলে শুধু যানজট দেখেছে এতদিন, তারাও আজ প্রতিবাদী মিছিলের শক্তিকে অস্বীকার করতে পারছে না। সে হিসাবে বিবেকবান মানুষের বিচারে এ বড় উজ্জ্বল দিন এবং শাসক শ্রেণির পক্ষে এ সুখের দিন নয়। আন্দোলন, প্রতিবাদ কখনও দাবি আদায় করতে পারে, কখনও পারে না। কিন্তু তা নিয়ে শাসক শ্রেণি বিশেষ মাথা ঘামায় না। তারা মাথা ঘামায় একটা বিষয়ে— প্রতিবাদ যেন আরও প্রতিবাদের জন্ম না দেয়! তারা জানে প্রতিবাদের শক্তি মাথা তুললে তা সমাজে বড় চরিত্র সৃষ্টির জমি তৈরি করে, মানুষকে চিন্তা করতে, ঠিক ভুল চিনতে শেখায়। আন্দোলনের রাস্তা মানুষকে সমাজটার খোলনলচে বদলে নতুন সমাজ আনার রাস্তা দেখতে শেখায়। দলীয় পতাকাহীন এই আন্দোলনের মধ্যে বহু মতের, পথের মানুষ মিশে আছেন। মানুষ তাঁদের ভূমিকা দেখছেন। কারা আন্দোলনকে নিজের দলের গদিলাভের হাতিয়ার করতে ব্যস্ত, অন্য দিকে কারা মানুষের সংঘশক্তি গড়ে তুলতে, তাদের নিজস্ব সংগ্রামের হাতিয়ার গড়ে তুলতে সচেষ্ট— সে রাজনীতির পার্থক্য একটু হলেও স্পষ্ট হবে। আন্দোলন চলতে চলতে ঠিক ভুলের দ্বন্দ্ব আসবে, মানুষ রাজনীতির পাঠ নিতে পারে এই রাস্তায় থাকতে থাকতেই। তারা চিনতে পারে দলগুলির স্বরূপকেও। লড়াই করতে শিখলে মানুষ এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে বিচারব্যবস্থার স্বরূপও চিনবে। সমাজ বদলের সঠিক পথও এই রাস্তাতেই চিনবে মানুষ। তাই আন্দোলনের রাজপথই সমাজ শিক্ষার সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয়। সেই কারণেই শাসক শ্রেণির সেবাদাস দলগুলি আন্দোলনের সম্ভাবনায় জল ঢালতে কখনও তড়িঘড়ি ধর্ষকের ফাঁসির দাবি তোলে, কখনও এনকাউন্টারে সব চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। এ বিষয়ে বিজেপি, তৃণমূল কিংবা কংগ্রেস কারও সঙ্গে কারও কোনও পার্থক্য নেই।

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের আহ্বানে ন্যায়বিচারের দাবিতে কলকাতায় এনআরএস হাসপাতাল থেকে রাজভবন পর্যন্ত ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মী-নাগরিকদের বিক্ষোভ মিছিল। ৭ সেপ্টেম্বর

এই আন্দোলনের পরে আর সমাজে ধর্ষণ থাকবে না, সরকারি গদির মধু-ভাণ্ডের চারপাশে ঘোরা রাজনৈতিক দলগুলো দুষ্কৃতীদের মদত দেওয়া বন্ধ করে দেবে, সরকারি দল দুর্নীতিকে আর প্রশ্রয় দেবে না, পুলিশ শাসক দলের হয়ে অপরাধ চাপা দেওয়ার চেষ্টা আর কোনও দিন করবে না— এমনটা ভেবে নেওয়া নিশ্চয়ই কষ্ট-কল্পনা। কিন্তু লাগামটা ছুঁড়ে ফেলার যে পথ এই আন্দোলন মানুষকে দেখিয়ে যাচ্ছে, তার শিক্ষা ব্যর্থ হতে পারে না। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর শিক্ষা— “স্কুলে-কলেজে, ঘরে বাইরে, পথে ঘাটে, যেখানে অত্যাচার, অবিচার বা অনাচার দেখিবে সেখানে বীরের মতো অগ্রসর হইয়া বাধা দাও। ... আমি আমার ক্ষুদ্র জীবনে শক্তি যদি কিছু সংগ্রহ করিয়া থাকি তাহা শুধু এই উপায়েই করিয়াছি।” এটাই শক্তির উৎস। ঠিক এই শিক্ষাটাকেই ভয় পায় শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি। তারা জানে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারলে মানুষ একদিন শুধু ধর্ষকদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলবে না, সমাজের সমস্ত অন্যায়ের প্রতিকারের পথেই ধাবিত হবে আন্দোলন। এ জন্য দেশের আসল শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি তাই সমাজে বিশেষত ছাত্র যুবদের নৈতিক মেরুদণ্ডটাকে নষ্ট করতে নানা আয়োজন করে। দুর্নীতি, মদ-মাদক-বিকৃত যৌনতার নেশায় তাদের সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দিতে চায় তারা। মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, ‘ভারতবর্ষের শাসক সম্প্রদায় জাতির নৈতিক চরিত্রটিকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা অত্যন্ত ধুরন্ধর। তারা জানে যে, শত অত্যাচার ও দমনপীড়ন করেও, না খেতে দিয়েও একটা জাতিকে একটা দেশের জনসাধারণকে শুধু পুলিশ ও মিলিটারির সাহায্যে বেশি দিন পদদলিত করে রাখা যায় না। ... যদি জনশক্তি মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, যদি তাদের নৈতিক বল অটুট থাকে...।”

আজ এই নৈতিক বলই মাথা তোলার শক্তি জোগাচ্ছে মানুষকে। পরস্পর হাত ধরে রাত জাগছে মানুষ, শয্যা কণ্টকময় হচ্ছে শাসকের।

পাঠকের মতামত

ভারতে উদ্বাস্তু সমস্যার প্রেক্ষাপট

'রাষ্ট্রহীন অ-নাগরিক' শীর্ষক হর্ষ মান্দারের প্রতিবেদনটি (০১/০৬) প্রণিধানযোগ্য। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় নিপীড়নের দিক যেমন তিনি তুলে ধরেছেন, তেমনই এ দেশে এনআরসি, এনপিআর-এর প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি এটিকে যথার্থই হিটলারের জর্মানির 'নুরেমবার্গ' আইনের সঙ্গে তুলনা টেনেছেন। সেখানে যেমন এই আইন বলে ভিন্ন ধর্মে বিয়েকে বেআইনি বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল, জার্মান-ইহুদিদের নাগরিকত্বের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং ভিন্ন ধর্মে বিয়ে ও যৌনতা অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল, তেমনই এখানেও নানা ধরনের আইন প্রণয়ন করে মুসলমান নাগরিকদের সম-নাগরিকত্বের অধিকার ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা হচ্ছে। তিনি ঠিকই উল্লেখ করেছেন যে, এর ফলে সে দিন জার্মানির ইহুদিরা হয়ে যান রাষ্ট্রহীন, অ-নাগরিক। ইহুদি ও জার্মানদের মধ্যে বিয়ে ও যৌনতা ছিল দণ্ডনীয় অপরাধ। প্রবন্ধ লেখক এর থেকে উদ্ভূত বিপজ্জনক এবং চূড়ান্ত অমানবিক দিকটি তুলে ধরে সময়োচিত এবং খুবই জরুরি কাজটি করেছেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রবন্ধটিতে যে ভাবে আলোচনা করা হয়েছে তার ফলে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের সবচেয়ে ভয়াবহ যে উদ্বাস্তু সমস্যা তার উপর যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়নি। অথচ এই সমস্যাটির ঐতিহাসিক বাস্তবতা সম্যক উপলব্ধি করতে না পারলে সমসাময়িক সমস্যা বা ঘটনাবলির সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। সার্ধ শতাব্দীব্যাপী বিশ্ব কাঁপানো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন, শত সহস্র শহিদের রক্তে রাঙানো দুর্জয় স্বাধীনতা সংগ্রাম— শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোনও হিন্দু রাষ্ট্র বা মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য হয়নি। বহু জাতি, উপজাতি, বহু বিচিত্র, বহু ধর্মাবলম্বী, বহু ভাষাভাষী জনগণ অধ্যুষিত এই বিশাল ভারতবর্ষে ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে সকল জনগণের একটি সার্থক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই এই মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। আজ চূড়ান্ত ট্র্যাজিক হলেও এটাই বাস্তব ঘটনা যে ছদ্মবেশী চক্রান্তকারী চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক শক্তি স্বাধীনতা আন্দোলনের এই মহান লক্ষ্যের বুকে ছুরি মেরে ধর্মের ভিত্তিতেই অখণ্ড ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে দুটি রাষ্ট্র — পাকিস্তান এবং হিন্দুস্তান তথা ভারতের জন্ম দিল। একটি হল ঘোষিত ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তান, অন্যটির নাম যাই হোক বাস্তবে এবং ধ্যান ধারণায় জন্মলগ্নে ভারত নামে একটি হিন্দু রাষ্ট্র। আজও সেই ধারণা সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে গিয়েছে তা বলা যায় না।

চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক দল সমূহ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের প্রশ্রয়ে স্বাধীনতার প্রাক্কালে অখণ্ড ভারতবর্ষে সংঘটিত হল পাশবিক নারী নির্যাতন এবং রোহমর্ষক সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড। এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণামে দ্বিখণ্ডিত হল অখণ্ড ভারত। জন্ম নিল ভারত ও পাকিস্তান। পাকিস্তান এবং ভারতে শুরু হল অসহায় নিরুপায় ভীত সন্ত্রস্ত আবাল বৃদ্ধ বনিতার ঘরবাড়ি সম্পত্তি সব ছেড়ে স্থায়ীভাবে ভারতে প্রবেশ করা। এই দেশ ছাড়ার স্রোত উভয় দেশেই মারাত্মক আকার ধারণ করল। এইভাবে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নিজেদের আপন দেশে যাচ্ছেন বলে যে সব হিন্দুরা ভারতে প্রবেশ করলেন তাদেরই সেদিন বলা হয়েছে উদ্বাস্তু এবং একই ভাবে, প্রায় একই পরিস্থিতিতে ভারত থেকেও যে সব মুসলমান মানুষ নিজেদের দেশে যাচ্ছেন বলে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানে গেলেন তাদেরও পাকিস্তানে বলা হল 'মোহজির' অর্থাৎ শরণার্থী। তাদের এই দেশত্যাগও সংখ্যায় ব্যাপক হয়েছে। নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তির পর তাদের একটা অংশ ভারতে ফিরে এলেও লাখ লাখ মুসলিম উদ্বাস্তুরা পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছেন। তারাও সেখানে মুসলিম শরণার্থী হিসাবে গণ্য হয়েছেন। পাকিস্তান অন্তর্ভুক্ত পাঞ্জাব এবং ভারত অন্তর্ভুক্ত পাঞ্জাবে কার্যত জনগণের বিনিময় হয়েছে। সেদিন এই অভূতপূর্ব মানবিক সমস্যা সমগ্র দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছে। উদ্বাস্তু সমস্যার মূলে নিহিত যে ভয়ঙ্কর ঘটনাবলি সেগুলি ভারতবর্ষের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকল মানুষকে সেদিন স্বাভাবিক কারণেই আবেগ বিহ্বল করে তুলেছে। অস্বীকার করার উপায় নেই— সমগ্র পাকিস্তানেও মানবিক কারণে সেখানকার 'মোহাজির'-দের সম্পর্কে পাকিস্তানের জনগণকে একই ভাবে আবেগময় করে তুলেছিল।

এই আবেগ বিহ্বল পরিস্থিতিতেই গান্ধীজি থেকে শুরু করে দলমত নির্বিশেষে সকল দেশনেতা— নেহেরু, প্যাটেল সহ সকল ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপ্রধানরা, যে লাখো লাখো উদ্বাস্তু এ দেশে ঢুকেছেন তাঁদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিয়ে পূর্ব-পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) এবং পশ্চিম পাকিস্তান— উভয় অংশের যে হিন্দু জনসাধারণ তখনও সেখানেই রয়েছেন, তাঁদের আশ্বস্ত করে বলেছেন— আপনাদের জীবন, আত্মসম্মান এবং আপনাদের জীবনের নিরাপত্তা যদি মারাত্মক ভাবে বিঘ্নিত হয় তা হলে ভারতের দরজা আপনাদের জন্য সবসময় খোলা থাকবে। জাতির পক্ষ থেকে সেদিন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু পার্লামেন্টেও আনুষ্ঠানিক ভাবে এই আশ্বাস দিয়েছেন। এটা জাতীয় দায়বদ্ধতা হিসাবেই লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। এটি ভুলে যাবার নয়। আজ পাকিস্তানে বসবাসকারী হিন্দু সংখ্যায় নিতান্তই কম। তাদের বেশিরভাগ আগেই দেশত্যাগ করে ভারতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। আর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেখানকার হিন্দুদের দেশ ছাড়াও উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে। হয়ত আগামী দিনে আরও হ্রাস পাবে। এই পটভূমিতেই অবিভক্ত ভারতের শরণার্থী সমস্যা বা উদ্বাস্তু সমস্যাকে বিশেষ রূপে ধরতে হবে ও আর পাঁচটা শরণার্থী সমস্যার সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে এর মধ্যে যে ঐতিহাসিক বাস্তবতা রয়েছে সেই সত্যটা হারিয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত, অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে এই শরণার্থীদের নাগরিকত্বের অধিকার প্রশ্নাতীত। এঁরা মনেপ্রাণে ভারতীয়। ভারতের জনগণও এঁদের পরমাত্মীয়, আপনজন বলেই মনে করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক কথা হচ্ছে— কিছু কিছু রাজ্যে কিছু কিছু মানুষ এই শরণার্থী সমস্যার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ভুলে গিয়ে উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী ভাবনা-চিন্তার শিকার হয়ে এদের নাগরিকত্বের বিরোধিতা করছেন। এটা সম্পূর্ণ অন্যায় এবং অনৈতিকহাসিক। এটা বিহিত করার জন্য জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তুলে এঁদের নাগরিকত্ব সুনিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যথার্থই জরুরি হয়ে উঠেছে।

এই সঙ্গে, এই কথাও উল্লেখ করা দরকার যে, এই প্রেক্ষাপটে তত্ত্ব এবং সত্যের দিক থেকে ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা মুসলিম শরণার্থীর ধারণাটিই যেমন একেবারে মিথ্যা, তেমনি বাস্তবেও কোনও মুসলিম শরণার্থী নেই। বিচ্ছিন্ন ভাবে অর্থনৈতিক কারণে মাইগ্রেশনের ঘটনা টুকটাক সব দেশেই আছে। তাকে শরণার্থী সমস্যা বলে গণ্য করা যায় না।

জয়দেব চক্রবর্তী, খড়্গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

চিঠিটি আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৯ জুলাই '২৪ প্রকাশিত হয়। কিন্তু কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ কর্তৃপক্ষ বাদ দেন। পুরো চিঠিটি ছাপার অনুরোধ করে লেখক আমাদের দপ্তরে পাঠান। লেখাটির গুরুত্ব অনুভব করে আমরা তা প্রকাশ করলাম।

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, কেরালা

সমাজ জুড়ে নারী নির্যাতন চলছেই

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী স্পেশাল ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের অধীনে জেলাগত ভাবে নজরদারি কমিটি গঠনের কথা বলেছেন— যাতে মহিলা ও শিশুদের উপর ঘটে চলা অত্যাচারের বিচার দ্রুত হতে পারে। আর জি করে ডাক্তারি ছাত্রীর নৃশংস ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দেশজোড়া ন্যায়বিচারের দাবিতে আন্দোলন প্রবাহ দেখে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 'অপরাজিতা' আইন এনেছেন।

যখন প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী মহিলা নিরাপত্তার কথা বলছেন, তখনই ঘটে চলেছে রাজ্যে রাজ্যে কদর্য ও নৃশংস সব ঘটনা। বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌয়ে মুমূর্ষু স্বামীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে অ্যাম্বুলেন্স চালক ও তার সহকারীর হাতে নিগৃহীত হন এক মহিলা। বাধা দেওয়ায় দুজনকেই চলন্ত অ্যাম্বুলেন্স থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় দুষ্কৃতীরা। পরদিন মারা যান ওই মহিলার স্বামী। হরিয়ানার ঝিন্দে এক কিশোরীকে অপহরণ করে ২০ দিন ধরে তার উপর অকথ্য অত্যাচার চালায় দুষ্কৃতীর। মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে প্রকাশ্য রাস্তায় এক অতি দরিদ্র মহিলার উপর পৈশাচিক অত্যাচার চালায় এক যুবক। পথচারীরা বাধা দেয়নি, তারা ঘটনার ভিডিও করতে ব্যস্ত ছিল। একটি ঘটনা নৃশংসতায় যেন আর একটিকে ছাপিয়ে যাচ্ছে।

দেশের পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে যখন নাগরিক আন্দোলনের ঢেউ চলছে আর জি কর হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তারের ধর্ষণ ও নৃশংস খুনের প্রতিকার চেয়ে, তখনই দক্ষিণে কেরালায় মালয়ালাম চলচ্চিত্র জগত তোলপাড় হচ্ছে মহিলা শিল্পীদের উপর যৌন নিগ্রহের ঘটনা নিয়ে। ঘটনার সাথে যুক্ত নামী চিত্রাভিনেতা, পরিচালক সহ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সাথে যুক্ত শাসক-ঘনিষ্ঠ প্রভাবশালী নেতা পর্যন্ত। সরকার গঠিত হেমা কমিটির রিপোর্টে শিল্পীদের উপর অত্যাচারের ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা কতটা ঠুনকো, দেখিয়ে দিচ্ছে নানা ঘটনাপ্রবাহ। কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা আটকানোর জন্য ২০১৩ সালে আইন চালু হয়েছে দেশে। দশ বছরের বেশি পেরিয়ে গেলেও যৌন হয়রানি, যৌন হয়রানিকে কাজ পাওয়ার এবং উন্নতির শর্ত বানিয়ে তোলার মতো শাস্তিযোগ্য অপরাধ কমেনি।

রাজ্যে রাজ্যে এ ধরনের নৃশংস ঘটনাপ্রবাহ বন্ধ হবে কী ভাবে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, শাসক বা ক্ষমতালোভী দলগুলি এই দুষ্কৃতীদের প্রশ্রয়দাতা। তারা মদত দিয়ে দুষ্কৃতীদের পুষ্ট করে, যাতে যে কোনও অন্যায় এদের দিয়ে করানো যায়। কারণ শাসন ক্ষমতায় থাকার সুবাদে হাজারো অন্যায় তারা করে থাকে। দুষ্কৃতীরাও জানে, দুষ্কর্ম করলেও শাসক 'দাদা-দিদিদের' হাত তাদের পিঠের উপর রয়েছে। ফলে শাস্তির আশঙ্কা নেই। শাসকরা প্রতিনিয়ত কাজ করে চলে অপরাধীকে আড়াল করায়। ফলে হাথরসের ঘটনায় আসল অপরাধীকে আড়াল করে খবর করতে যাওয়া সাংবাদিককে জেলে পোরা হয়, বিজয়ী বীরের সম্বর্ধনা দেওয়া হয় জেল থেকে ছাড়া পাওয়া বিলকিস বানোর ধর্ষক-অপরাধীদের, কিংবা কাঠুয়ায় নিষ্ঠুর ভাবে কিশোরীকে খুন করা ধর্ষকদের হয়ে মিছিল করে শাসক দলের সাংসদ-বিধায়করা। শাসকের এই প্রশ্রয়ই আরও অপরাধের জন্ম দিতে সাহায্য করে।

আজ যারা দিকে দিকে এ ধরনের ঘটনা দেখে ব্যথিত হচ্ছেন, ভাবছেন সমাজটা কী করে দুষ্কৃতীদের আঁতুড়ঘর হল? বুঝতে হবে সমাজের এই পরিস্থিতি একদিনে ঘটেনি। বর্তমান সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সমাজে চরম স্বার্থপরতা, ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে চরম উৎশৃঙ্খলতার জন্ম দিয়ে চলেছে। এই ব্যবস্থার রক্ষক বৃহৎ সংবাদমাধ্যম 'পারমিসিভ সোসাইটি'র নামে ডিস্কো-থেকে মদের ফোয়ারা, যৌন যথেচ্ছাচারের নাম দেয় 'সাবালকত্ব'। তাদের মদতপুষ্ট সাহিত্যে এই যথেচ্ছাচারকেই মধ্যবিত্ত সমাজের স্বাভাবিক চিহ্ন বলে তুলে ধরে। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত পরিবারে টিকে থাকা মানবিক মূল্যবোধগুলি এই কর্পোরেট মদতপুষ্ট উচ্চকোটির মানুষজনের বিদ্রূপের শিকার। এই সমাজই ছাত্র যুবকদের শেখায় 'আধুনিক' হওয়া মানে পঙ্কিল স্রোতে গা ভাসানো। সমাজে গেড়ে বসে থাকা পুরুষতান্ত্রিকতা ইতিমধ্যেই মেয়েদের ভোগ্য বস্তু হিসাবে দেখাতে শেখায়। এই সমাজব্যবস্থা শেখায় মানব জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব কিছুই পণ্য। নারী শরীর মহার্ঘ পণ্য।

এই পরিস্থিতি সাগ্রিকভাবে সমাজের মূল্যবোধের কাঠামোয় ঘুন ধরাতে বাধ্য। পরিবারে পরিবারে তার বিষময় ফল আজ ফুটে বোরোচ্ছে। এর সাথে ইন্টারনেট, স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে অবাধ যৌনতার প্রসার চলছে। সব মিলিয়ে এ সমাজে নাগরিক জীবন এক পঙ্কিল ঘুর্ণিতে হাবুডুবু খাচ্ছে। আর জি করের রক্তাক্ত মেয়েটি এই সমাজ মননে একটা জোর ঝাঁকুনি দিয়েছে। মানুষ সচেতন হয়ে উঠে দাঁড়াতে চাইছেন। এটাই আশার।

অস্থায়ী কর্মী দিয়েই চলছে সরকার

স্থায়ী পদে কখনও চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ করা যায় না— সম্প্রতি নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলার শুরুতেই এ কথা বলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবগণনম। তিনি বলেন, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ কোনও রীতি হতে পারে না। এই ধরনের নিয়োগ ব্যতিক্রম বলে গণ্য হতে পারে। তিনি ক্ষোভের সাথে আরও বলেন, কর্মীর অভাবে জেলা কোর্টগুলি ধুঁকছে। ফাইল বয়ে আনার গ্রুপ ডি কর্মী পর্যন্ত নেই। সরকারি উকিলকে কটাক্ষ করে তাঁর মন্তব্য, আপনারা তো নিয়োগের ক্ষেত্রে চুপ করে বসে আছেন (সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ সেপ্টেম্বর '২৪)।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির এই মন্তব্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যের তৃণমূল সরকার কী অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছে! শুধু কোর্ট নয়, প্রশাসনের সর্বস্তরের কর্মীসংখ্যার ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। কেন সরকার তৎপরতার সাথে নিয়োগ করে না? ন্যূনতম যদি কিছু নিয়োগ করেও, কেন স্থায়ী কর্মী হিসেবে নিয়োগ করে না? এর ফলে জনপরিষেবা যে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে,তা নিয়ে সরকার কেন এতটুকু ভাবিত হয় না?

এর মূলে রয়েছে সরকারের জনবিরোধী নীতি। সরকারও একটা পুঁজিবাদী মালিকের মতো কর্মী ও কর্মসংকোচনের নীতি নিয়ে চলছে। পুঁজিপতিরা সর্বোচ্চ মুনাফা করতে সর্বদা ব্যয় সঙ্কোচের নীতি নিয়ে চলে। তারই অন্যতম অঙ্গ হল ন্যূনতম কর্মী নিয়োগ এবং স্থায়ী পদগুলিকে অস্থায়ী করে দেওয়া। স্থায়ী পদে নিয়োগ হলে শ্রম আইন অনুযায়ী আর্থিক যেসব শর্ত মালিককে মানতে হয়, অস্থায়ী নিয়োগ হলে শ্রমিকদের আর তা দিতে হয় না। ফলে মুনাফা সর্বাধিক করতেই সর্বত্র পুঁজিপতিরা এই নীতি নিয়ে চলছে। পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন তত্ত্ব এই নীতিতেই সিলমোহর দিয়েছে। বিশ্বের সব দেশেই তার প্রয়োগ জনপরিষেবাকে ব্যাহত করছে। ন্যূনতম স্থায়ী কর্মী ও সর্বাধিক অস্থায়ী কর্মী নিয়ে চলছে এক একটা প্রতিষ্ঠান।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরিচালক সরকারও জনস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে একই নীতি নিয়ে চলছে। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ব্যাপক হারে শিক্ষকশূন্যতায় ধুঁকছে। এর ফলে শিক্ষাদান মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা সরাসরি বঞ্চিত হচ্ছে। আর শিক্ষিত চাকরিপ্রার্থীরা হারাচ্ছে কাজের সুযোগ। রাজ্যের তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে এই যে ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটছে আর জি করের ঘটনাকে কেন্দ্র করে, তার পিছনে এই ধরনের বঞ্চনার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্রোধও কাজ করছে।

শূন্য পদে নিয়োগের দাবিতে, বেতন বৈষম্য অবসানের দাবিতে মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়বেই। চাকরির স্থায়ী শূন্য পদগুলি নানা অজুহাতে অপূরিত রেখে দেওয়ার অধিকার একটা সরকারের নেই। অতি দ্রুত রাজ্য সরকারকে এই সব শূন্যপদ পূরণ করতে হবে। রাজ্যের তৃণমূল সরকার যদি দ্রুত এ সব পূরণ না করে তবে যুব বিক্ষোভ আরও ব্যাপক হবে।

পুরুলিয়ায় স্পঞ্জ আয়রন কারখানার দূষণে অতিষ্ঠ মানুষ

খরাপীড়িত জেলা পুরুলিয়া অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া হলেও নানা সম্পদে ভরপুর। নিতুড়িয়া ব্লকে কয়েকটি স্পঞ্জ আয়রন কারখানা গড়ে উঠেছে। কিন্তু এই কারখানার দূষণে জনজীবনে নেমে এসেছে নানা সংকট। কারখানাগুলিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকায় বায়ু দূষিত হচ্ছে এবং মানুষ মারণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। কারখানাগুলির বর্জ্য ছাই যেখানে সেখানে ফেলায় ধ্বংস হচ্ছে সবুজ গাছপালা ও চাষযোগ্য উর্বর জমি। রেহাই পাচ্ছে না নিচু জলা জমি থেকে সৃষ্ট জলনিকাশির রাস্তা। ধ্বংসের মুখে হাড়মাড্ডি ক্ষুদ্র জলসেচ প্রকল্প এবং কারখানার লাগোয়া বড় বড় পুকুর। বরাকর-পুরুলিয়া ৩৫ নম্বর রাজ্য সড়কের দুই দিকে জমির অসাধু ব্যবসায়ী গোষ্ঠী আশপাশের চাষের জমিতে যাওয়ার রাস্তা পর্যন্ত বন্ধ করে দিচ্ছে। ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল বনাঞ্চল গড়পঞ্চকোট পাহাড়।

এই এলাকায় নানা ধরনের যে শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে সেগুলিতে শ্রমিকদের আইনসঙ্গত কোনও মজুরি নেই। শ্রমিকদের ২০০ টাকা মজুরিতে ১০-১২ ঘণ্টা কাজ করানো হয়। এ দিকে এই রাস্তায় বাইক আরোহী ব্যক্তির গায়ে, চোখে ছাই লেগে কী অবস্থা হয় তা ভুক্তভোগী বাইক চালকরাই বোঝে। বিভিন্ন মালবাহী লরিতে অভিজ্ঞ কোনও ড্রাইভার না থাকার ফলে পথ দুর্ঘটনায় মানুষের মৃত্যু নিত্যদিনের ঘটনা। পুলিশ-প্রশাসন, শ্রম আইন নিশ্চুপ। মানুষ প্রতিবাদ করেও কোনও সুরাহা পাননি। কর্তৃপক্ষ সমস্যা সমাধানে তৎপর না হলে মানুষ সংগঠিত হয়ে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনে নামবে।

গ্রামীণ ডাক্তারদের সংবর্ধনা পিএমপিএআই-এর

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার পরিচালিত ও পিএমপিএআই আয়োজিত প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী তৈরির কোর্সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দুই গ্রামীণ চিকিৎসককে সংগঠনের ষষ্ঠ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা দেওয়া হল কলকাতার ভারত সভা হলে, ১ সেপ্টেম্বর। অহিদুল ইসলাম সেখ এবং বিপ্লব বেরা নামের এই দুই গ্রামীণ ডাক্তার কার্ডিয়াক ম্যাসাজ দিয়ে দু'জন রোগীকে বাঁচিয়ে তুলেছেন। এ ছাড়াও ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে প্র্যাক্টিস করছেন এমন তিন গ্রামীণ চিকিৎসক ছাড়াও কলকাতা আইআইএমসি মিশনের নির্দেশক ডাঃ সুজিত ব্রহ্মচারীকেও সংবর্ধিত করা হয়।

এক বছর ধরে প্রশিক্ষণ এবং দু'বার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর প্রায় ২০০ জন আইএইচসিপি গত সেশনে সাফল্য অর্জন করেছে। তাঁদের শংসাপত্র, মার্কশিট, আইকার্ড ও স্মারক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা চিকিৎসক ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলির ছবি সংবলিত স্মারক সকল সফল স্বাস্থ্যকর্মীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোর্সের চেয়ারম্যান প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, ডাঃ অশোক সামন্ত, ডাঃ নীলরতন নাইয়া, ডাঃ তিমির কান্তি দাস, ডাঃ বিজ্ঞান বেরা, ডাঃ ভবানী শংকর দাস প্রমুখ।

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রতিবাদ সভা

অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি পশ্চিমবঙ্গের আহ্বানে ৫ সেপ্টেম্বর কলকাতার ত্রিপুরা হিতসাধনী হলে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে শতাধিক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকাগণ উপস্থিত ছিলেন। আর জি কর কাণ্ডে ধর্ষণ ও নৃশংস খুনের প্রতি তীব্র ধিক্কার জানান হয়। গৃহীত এক প্রস্তাবে দ্রুত ন্যায়বিচার ও দোষীদের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানান হয়।

এর পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্তদের দুর্বিষহ জীবনের কিছু পেশাগত দাবি তুলে ধরা হয়, যেমন, কেন্দ্রীয় হারে ডিএ, বার্ষিক পেনশন বৃদ্ধি, গৃহভাড়া ভাতা প্রদান ইত্যাদি। সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক কার্তিক সাহা, সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য প্রমুখ।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে সেচমন্ত্রীকে স্মারকলিপি

পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ অবিলম্বে শুরু সহ ছ'দফা দাবিতে ৩০ আগস্ট রাজ্যের সেচ ও জলপথ দপ্তরের মন্ত্রী মানস ভুঁইঞার সাথে কলকাতার জলসম্পদভবনে দেখা করে স্মারকলিপি দেয় ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটি। প্রতিনিধিদলে ছিলেন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, কার্যকরী সভাপতি সত্যসাধন চক্রবর্তী, অফিস সম্পাদক কানাইলাল পাখিরা, জগদীশ মণ্ডল অধিকারী, জগন্নাথ বেরা, প্রশান্ত সামন্ত প্রমুখ।

শিলাবতী নদীর উপর সাহেবঘাটে এবং রূপনারায়ণ নদীর উপরে বন্দর এলাকায় কংক্রিটের ব্রিজ নির্মাণ সহ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কেলেঘাই নদীর নিম্নাংশ লাঙলকাটা থেকে ঢেউভাঙা পর্যন্ত অংশ ও সোয়াদিঘি, দেহাটি প্রভৃতি নিকাশি খালগুলি পূর্ণ সংস্কারের দাবিতেও স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কমিটির পক্ষ থেকে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ শুরু করার মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অবিলম্বে রূপায়ণের দাবি জানানো হয়।

মন্ত্রী দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, মাস্টার প্ল্যানের যে কাজগুলি করা হবে, তা নিয়ে সার্ভে চলছে।

জীবনাবসান

পুরুলিয়া জেলার বাগমুণ্ডি থানায় এস ইউ সি আই (সি)-র বুড়দা-কালিমাটি লোকাল কমিটির পূর্বতন সম্পাদক এবং দলের আবেদনকারী সদস্য কমরেড অদ্বৈত প্রসাদ সিং বাবু বার্ধক্যজনিত কারণে দীর্ঘ রোগভোগের পর ২৬ আগস্ট প্রয়াত হন। বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর দলের স্থানীয় কর্মী-সমর্থক সহ এলাকার বহু মানুষ তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। দলের পুরুলিয়া জেলা (দক্ষিণ) সম্পাদকের পক্ষ থেকে মাল্যদান করেন জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড সুবর্ণ কুমার। মাল্যদান করেন জেলা কমিটির সদস্য ও লোকাল সম্পাদক কমরেড অজিত প্রসাদ মাহাতো সহ এলাকার বহু বিশিষ্ট মানুষ।

১৯৪৫ সালে এলাকার এক জমিদার পরিবারে জন্ম হয়েছিল কমরেড অদ্বৈত প্রসাদ সিং বাবুর। পরিবার ছিল তৎকালীন কংগ্রেসের কট্টর সমর্থক। তিনিও ষাটের দশকের শেষভাগ পর্যন্ত কংগ্রেসের সাথেই যুক্ত ছিলেন। প্রথমে এলাকার বিশিষ্ট জননেতা কমরেড সাধু ব্যানার্জী এবং পরে কমরেড স্বপন রায়চৌধুরীর সংস্পর্শে আসার পর তিনি এস ইউ সি আই (সি)-র সঙ্গে যুক্ত হন। এর পরে তিনি জমিদারির সমস্ত আভিজাত্য পরিত্যাগ করে এলাকায় সংগঠন গড়ে তোলার নিরলস প্রচেষ্টা শুরু করেন এবং কালক্রমে দলের নেতৃস্থানীয় সংগঠকে পরিণত হন।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত দরদি মনের মানুষ। এলাকার গরিব মানুষ তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তিনি এলাকার গ্রামে গ্রামে কমরেড স্বপন রায়চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে মজবুত সংগঠন গড়ে তোলেন। পরপর দু'বার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নির্বাচিত হলেও দুর্নীতি তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেককে সমান দৃষ্টিতে দেখতেন। জীবিতকালে নিজের গ্রামে তিনি কোনও মামলা হতে দেননি। মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সমস্ত বিবাদ গ্রামের মধ্যেই মীমাংসা করতেন। তিনি ছিলেন অসীম সাহসী এবং দৃঢ়চেতা। তাঁর সাহসিকতার বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে। যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলা করার ক্ষমতা তাঁর ছিল। সমস্ত গ্রাম তাঁর অনুগামীতে পরিণত হয়েছিল। তাঁর বাড়ি দলের কর্মী-সমর্থকদের জন্য ছিল অবাধ। অসুস্থ অবস্থাতেও মৃত্যুর কয়েক মাস আগে পর্যন্ত তিনি দলের কাগজপত্র খুঁটিয়ে পড়তেন এবং কমরেডদের কাছে দলের খোঁজখবর নিতেন। তিনি ছিলেন এলাকায় দলের খুঁটি এবং সাধারণ মানুষের অভিভাবক স্বরূপ। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন গুরুত্বপূর্ণ কমরেডকে হারাল এবং সাধারণ মানুষ হারালেন তাঁদের অভিভাবককে।

কমরেড অদ্বৈত প্রসাদ সিং বাবু লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 7 Bengali Weekly September 13, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

জেলায় জেলায় আশাকর্মী সম্মেলন

সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি, ২৬ হাজার টাকা মাসিক বেতন, পিএফ-পেনশন-গ্র্যাচুইটি প্রদান, উৎসাহ ভাতা একসাথে প্রদান, সকল নারী কর্মীর নিরাপত্তা সহ অন্যান্য দাবিতে বিভিন্ন জেলায় এআইইউটিইউসি অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের জেলা ও ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

● **পূর্ব মেদিনীপুর ঃ** সংগঠনের দ্বিতীয় জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ২৫ আগস্ট মেছেদার বিদ্যাসাগর হলে। আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে মিছিলের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ছশোরও বেশি আশাকর্মী যোগ দেন সম্মেলনে। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন জেলা যুগ্ম সম্পাদিকা ইতি মাইতি। উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের উপদেষ্টা অনুরূপা দাস, রাজ্য সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন, রাজ্য সভানেত্রী কৃষ্ণা প্রধান। ১৪ দফা দাবি সনদ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সম্মেলন থেকে শ্রাবন্তী মণ্ডলকে সভানেত্রী, ইতি মাইতি ও মানসী দাসকে যুগ্ম সম্পাদিকা এবং সুদেষ্ণা দাসকে অফিস সম্পাদিকা করে ৯৮ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে বক্তব্য রাখছেন ইসমত আরা খাতুন

● **দিনহাটা ঃ** ৩০ আগস্ট দিনহাটা শহরে কোচবিহার জেলার দিনহাটা-২ ব্লকের আশাকর্মীদের তৃতীয় ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন দেড় শতাধিক আশাকর্মী। প্রধান বক্তা ছিলেন ইউনিয়নের জেলা সম্পাদিকা রিনা ঘোষ। পার্বতী বর্মনকে সভানেত্রী, শিবানী বর্মন রায়কে সম্পাদিকা ও প্রমীলা বর্মনকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে ৩৩ জনের ব্লক কমিটি গঠিত হয়।

বীরভূমে রামকৃষ্ণ সভাগৃহে প্রতিনিধিরা

● **বীরভূম ঃ** ৩১ আগস্ট খাদ্য আন্দোলন ও বাসভাড়া বৃদ্ধিবিরোধী আন্দোলনের শহিদ দিবসে ইউনিয়নের বীরভূম জেলা তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল সিউড়ি শহরের রামকৃষ্ণ সভাগৃহে। জেলার সমস্ত ব্লক থেকে প্রায় ৫০০ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। আলোচক ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য অনুরূপা দাস ও অমল মাইতি। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী। সম্মেলন থেকে নমিতা দাসকে সভাপতি এবং মাধবী সিনহা ও সারদা দত্তকে যুগ্ম সম্পাদিকা করে ৬৫ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

● **মালদা ঃ** ২ সেপ্টেম্বর মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের প্রথম মালদা জেলা সম্মেলন। জেলার সমস্ত ব্লক থেকে সহস্রাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা, এআইইউটিইউসি সহ-সভাপতি কমরেড নন্দ পাত্র, মালদা জেলা সম্পাদক কমরেড অংশুধর মণ্ডল প্রমুখ। ললিতা রাজবংশীকে জেলা সভাপতি এবং মেহেবুবা খাতুনকে জেলা সম্পাদিকা করে ৫৭ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলন শেষে আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে আশাকর্মীরা মিছিল করে রথবাড়ি মোড়ে বিক্ষোভ দেখান।

বিদ্যাসাগর হল। মেছেদা, পূর্ব মেদিনীপুর

নয়া পেনশন স্কিম এক প্রতারণা ঃ এআইইউটিইউসি

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ইউনিফায়েড পেনশন স্কিম (ইউপিএস) নামে যে পেনশন প্রকল্প এনেছে তার তীব্র বিরোধিতা করে এ আই ইউ টি ইউ সি -র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত ২৬ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, সারা দেশের সরকারি কর্মচারীরা পুরনো পেনশন স্কিম চালু করার দাবি করলেও কেন্দ্রীয় সরকার ইউপিএস নিয়ে ধূর্ত প্রচার করে সরকারি কর্মচারীদের বিভ্রান্ত করতে চাইছে।

পুরনো পেনশন স্কিমের ঠিক বিপরীত রাস্তায় গিয়ে বিজেপি সরকার 'নতুন পেনশন স্কিম' (এনপিএস) চালু করেছিল। এই স্কিমে কর্মচারীদের বিনিয়োগ করা টাকাতেই পেনশন দেওয়ার নীতির বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে প্রতিবাদ ওঠায় এখন কয়েকটি রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের সামনে চমক দিতে বিজেপি সরকার ইউপিএস-এর কথা বলেছে। এতেও একই রকম ভাবে কর্মচারীদের টাকাতেই পেনশন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই স্কিমে কর্মচারীরা পুরনো স্কিমের থেকে অনেক কম পেনশন পাবেন। নিশ্চিত পেনশনের নামে এই স্কিমে সরকারি কর্মচারীদের সাথে প্রতারণাই করা হয়েছে। কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

বিচারহীনতার প্রতিবাদে কলকাতা জুড়ে জনতার আদালত

৯ সেপ্টেম্বর বিচারহীনতার একমাসে কলকাতার শ্যামবাজার, যাদবপুর ৮বি, খিদিরপুর, রাসবিহারী ও বেহালা সখেরবাজারে জনতার আদালত বসে। শ্যামবাজারে প্রাক্তন বিচারপতি অনন্ত বর্মন, আইনজীবী কার্তিক রায়, ডাঃ নিখিলা মুরলী, যাদবপুরে ডাঃ নাসরিন আলি, আইনজীবী লীলাময় মণ্ডল ও শীর্ষ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক মহীদাস ভট্টাচার্য, রাসবিহারীতে ডাঃ নয়ন পাঠক, আইনজীবী অয়ন চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বহু নাগরিক তাঁদের বক্তব্য রাখেন। ছবি ঃ যাদবপুর ৮বি

শ্রমিকবিরোধী সরকারি নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ার ডাক এআইইউটিইউসি-র সম্মেলনে

● **পূর্ব মেদিনীপুর ঃ** শ্রমজীবী মানুষের বিভিন্ন দাবিতে ২৮ জুলাই তমলুকের ডিস্ট্রিক্ট সিভিল বার অ্যাসোসিয়েশন হলে এআইইউটিইউসি-র পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠিত ও অসংগঠিত বিভিন্ন শিল্পের স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মী, স্কিম ওয়ার্কার, বিড়ি ও হোসিয়ারি শ্রমিক, নির্মাণকার্য সহ বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত তিন শতাধিক শ্রমিক-কর্মচারী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন জেলা সম্পাদক মধুসূদন বেরা। তা নিয়ে বিভিন্ন পেশার ৩৫ জন শ্রমিক প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ নেন। সভার প্রধান বক্তা সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা তার সমাধান সম্পর্কে বিস্তৃত বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়াও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন গৌরীশংকর দাস, ফণীভূষণ চক্রবর্তী, সমরেন্দ্রনাথ মাজী, মানস সিনহা, জ্ঞানানন্দ রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সম্মেলন থেকে মধুসূদন বেরাকে সম্পাদক ও সমরেন্দ্রনাথ মাজীকে সভাপতি করে ৪০ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়। নির্বাচিত নতুন জেলা কমিটি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ গ্রহণ করেন এবং আগামী ১৫-১৬ নভেম্বর শিলিগুড়িতে রাজ্য সম্মেলন সফল করার আহ্বান জানান।

● **ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা ঃ** ২৪ আগস্ট উত্তর ২৪ পরগণার শ্যামনগর ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগার হলে কমরেড কমল ভট্টাচার্য মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল এআইইউটিইউসি-র ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার প্রথম সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের বিশিষ্ট নেতা কমরেড শুভাশিস দাস, মোটরভ্যান ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক কমরেড জয়ন্ত সাহা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন কমরেড অমল সেন। কমরেড প্রদীপ চৌধুরী সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন।

সম্মেলনে আগত মোটরভ্যান চালক, টোটো চালক, আশাকর্মী, আইসিডিএস কর্মী, মিড-ডে মিল কর্মী, নির্মাণ কর্মী, হকার, জুট শ্রমিক, বিদ্যুৎ শ্রমিক, রেল শ্রমিক, ব্যাঙ্ককর্মী ও সরকারি কর্মচারী সহ বহু ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীদের সমস্যা সম্পর্কিত প্রস্তাবের উপর মূল্যবান আলোচনা করেন। কমরেড অমল সেনকে সভাপতি ও দেবাশীষ ব্যানার্জীকে সম্পাদক করে এআইইউটিইউসি-র ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার প্রথম কমিটি গঠন করা হয়।

দিল্লিতে এস ইউ সি আই (সি)-র বিক্ষোভ

বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, নারী-নির্যাতন ও স্মার্ট মিটার চালুর প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে দিল্লির উপরাজ্যপালের দফতরে বিক্ষোভ। ৪ সেপ্টেম্বর

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com